‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ বিবেচনার পঞ্চাশ বছর

চিত্ত মণ্ডল

‘একুশে ফেব্রুয়ারি’, কিংবা ‘একুশে’ শব্দবন্ধ বা শব্দ উচ্চারিত হলে চেতনায় ‘মাতৃভাষার অধিকার’ এবং ভাষাভিত্তিক বাঙালি-জাতিসত্তার মনোবাসনা ‘বাংলাদেশ’ নামক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রতীকী হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের বাংলা-সংস্কৃতি, মাতৃভাষার সংগ্রাম স্বাধিকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন এখন বাঙালি-জাতীয়তাবাদের গন্ডি ছড়িয়ে আন্তর্জাতিক মান ও মর্যাদায় আসীন হয়েছে। এটা একটা দেশ ও জাতির পক্ষে গৌরবের পরাকাষ্ঠা বহন করে। ১৯৫২ সালের পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন এখন বিশ্ববাসীর ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃত ও চিহ্নিত হওয়ার ফলে বৃহৎ ভাষাভাষি জাতি ও ক্ষুদ্র বিপন্ন ভাষাগোষ্ঠীর স্বাধিকার ও অস্তিত্বের প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বিপন্ন ভাষার সংরক্ষণ, ভাষার ওপর ঘরে-বাইরের আক্রমণ এবং ভাষা ও কোনো জাতিকে সংস্কৃতিহীন ক্রীতদাসে পরিণত করার অপকৌশল এখন পরাহত। বাংলাদেশের ‘একুশ’কে কেন্দ্র করে যেমন গোটা বিশ্বজুড়ে ভাষাপ্রীতি ও জাতিসত্তার ঘুরে দাঁড়াবার প্রত্যয় জন্ম নিয়েছে, তেমনি নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে চর্চার ধারা এখন ক্রমশ বেগবান হচ্ছে। ভাষা ও সংস্কৃতি না থাকলে কোনো জাতির অস্তিত্ব থাকে না। সেই মানবগোষ্ঠী ক্রীতদাসে পরিণত হয়, এই বোধ এখন জনমানসে ক্রমশ বদ্ধমূল হচ্ছে। এই বোধি থেকেই ‘একুশে’ বা ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’—কে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষত কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যিকদের ভাষাসংক্রান্ত চর্চার দিগন্তও প্রসারিত হয়েছে। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে স্ব স্ব জাতিসত্তার মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবিকে আরো সমুন্নত করেছে। তবে ‘একুশে’র বিষয়ে কলকাতার সাহিত্যিকদের রচনার ধারা তেমন বেগবান না হলেও পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং আসামের বাঙালিদের মধ্যে মাতৃভাষার অধিকারের চেতনাকে সুদৃঢ় করেছে। মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে বিশ্বের এবং ভারতের বাঙালিদের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা যাক। এই পৃথিবীতে মাতৃভাষা যাঁদের বাংলা, তাঁদের সংখ্যা ৩০ কোটির ওপরে। সারা বিশ্বের মোট জন সংখ্যার প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৪ জনের মাতৃভাষা বাংলা। জনসংখ্যার বিচারে বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যানুসারে রাষ্ট্রসংঘের সরকারী ভাষায় কাজকর্ম করার প্রেক্ষিতে বাংলা ভাষার স্থান পঞ্চম। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজ্যে বাঙালি সংখ্যা একরকম : অসমে ৪৯ লক্ষ; বিহারে ও ঝাড়খন্ডে ২৫ লক্ষ, মধ্যপ্রদেশে ২ লক্ষ, ওড়িশায় ৪ লক্ষ, ত্রিপুরায় ১৯ লক্ষ, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৭০ হাজার, মেঘালয়ে দেড় লক্ষ এবং দিল্লীতে ২৩ হাজার। এই পরিসংখ্যানের বিবেচনায় ভারতের বঙ্গভাষাভাষি মানুষের মধ্যে ‘একুশ’ কে নিয়ে উন্মাদনা ও চর্চা অব্যাহত আছে। একথা ঠিক যে, ১৯৫২ সালে যখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) রক্তাক্ত ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি-জাতীয়তাবাদ, স্বাধিকার ও স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মের অঙ্কুরোদগমন হয় বাংলাদেশে, তখন ভারতের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও সাময়িকীতে সংবাদ

পরিবেশন, সম্পাদকীয় এবং নিবন্ধ রচিত হতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, একুশের চেতনা তখন স্বল্প সংখ্যায় হলেও সঞ্চারিত পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গভাষী বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যেও। তবে একথা ঠিক যে, বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের সংবাদ গোড়া থেকেই এদেশের সংবাদপত্র, বিশেষত 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'দি স্টেটসম্যান' 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'হিন্দুস্তান স্ট্যানডার্ড' 'মতামত' ইত্যাদিতে ফলাও করে প্রকাশিত হওয়ার ফলে সমকালীন বুদ্ধিজীবীমহলের তা সৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং একারণেই প্রবন্ধ, নিবন্ধ, চিঠিপত্র ও কবিতা রচনা করে তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। প্রতিক্রিয়াজাত এইসব রচনার তাৎক্ষণিক উপযোগিতাকে অস্বীকার করা যাবে না।

২

'সংবাদমূলত কাব্য'

পাঁচের দশকের গোড়ায় সংঘটিত পূর্ব বাংলার ভাষা-আন্দোলন বা 'একুশের' আন্দোলনের সংবাদ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, একথা গোড়াতেই বলেছি। তবে একথা ঠিক যে, বাংলাদেশের একুশের ভাষা-আন্দোলনের সূত্রপাত যে, দেশভাগের পরের বছরেই হয়েছিল, তা এখন প্রমাণিত এবং কলকাতার 'স্বাধীনতা' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকার' বিভিন্ন সংবাদভাষ্য পাঠ করলেই তা অনুধাবন করা যায়। ১৯৪৮ সালের ভাষা-সংক্রান্ত বিতর্কও তৎকালীন সংবাদপত্রের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। তবে ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনকে ভারতীয় সংবাদপত্র বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পরিবেশন করে। দেখা যায় ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকায় 'ভাষা দমনে গুলী' শীর্ষক সম্পাদকীয়কে বলা হয়েছে : 'ইহা বস্তুত সাধারণ জনমতের উপর এবং জনসাধারণের এক স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক দাবীর উপর গুলিবর্ষণ। ইহা ন্যূনতম গণতন্ত্রের নীতি ও আদর্শকে হত্যা করিবার প্রয়াস।' ২৪ তারিখে প্রকাশিত 'মাতৃভাষার জন্য' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বাংলাভাষীদের 'একুশে'-এর আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়ে লেখা হয় 'পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ ও পরিষদের সদস্যগণের বাঙলা ভাষার এই দাবী এতই যুক্তিপূর্ণ এবং সত্য ও সঙ্গত যে, আজ না হউক, কাল তাহা করাচীর কর্তৃপক্ষকে স্বীকার করিতেই হইবে।" আজ হইাই বলিবার ও হৃদয়ঙ্গম করিবার যে, ঢাকার ছাত্রগণের মাতৃভাষার প্রতি মর্যাদাবোধ এবং তাঁহাদের আদর্শনিষ্ঠাই পূর্ব্ববঙ্গের সাড়ে চার কোটি নরনারীর মাতৃভাষাকে অমর্যাদা ও উপেক্ষার হাত হইতে রক্ষা করিবার প্রাথমিক প্রয়াস জয়যুক্ত হইয়াছে।' পরে ২৬ ফেব্রুয়ারির' 'দুর্বুদ্ধি', ৮ মার্চ-এর 'মুস্কিল আসান-'এ' রাষ্ট্রভাষা বাঙলার সপক্ষে সম্পাদকীয়কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র 'মতামত'-এর ১৯৫২ সালের ১ মার্চ (৩য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা) অনিমেষ রায় 'মাতৃভাষার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীর বীরত্বপূর্ণ লড়াই' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ঐ নিবন্ধে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোন থেকে ভাষার বিশ্লেষণ করে বলা হয় ঃ 'বাঙালীর মাতৃভাষাকে রক্ষা করার জন্য বাঙালীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য পূর্ব বাংলার বাঙালীর লড়াই, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দুই বাংলার স্বাধীনতার লড়াই, সাম্রাজ্যবাদের ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের মুক্তির লড়াই; বিশ্ব মানবের শান্তি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার লড়াই।' প্রগতিমনস্ক 'পরিচয়' এবং 'নতুন সাহিত্য' সাময়িকীতে 'একুশে'র সংগ্রামকে মহিমান্বিত করে সম্পাদকীয় ও নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়। 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক এবং বিশিষ্ট কবি

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ফাল্গুন ১৩৫৮ সালের সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তাঁদের আত্মত্যাগের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে লেখেন : 'মাতৃভাষার দাবি মুখে নিয়ে পূর্ব বাংলার যে অজ্ঞাতনাম অগণিত শহীদ খন্ডিত বিক্ষিপ্ত বাঙালী জাতির হাতে রক্তের রাখী বেঁধে দিল, তাদের স্মৃতিস্তম্ভ গুঁড়ো গুঁড়ো করে মাটিতে মিশিয়ে দিলেও বাঙালীর স্মৃতি থেকে কেউ সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের মুছে দিতে পারবে না।' 'পরিচয়ের' ১৯৬০ সালের ভাদ্র সংখ্যায় বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও লেখক গোপাল হালদারের বাঙলা ভাষা-সমস্যা' প্রবন্ধেও 'একুশের' সংগ্রামকে ভাষার জন্য লড়াইয়ের আদর্শ হিসেবে তুলে ধরেছেন। 'দেশ' পত্রিকায় একুশের আন্দোলনকে গোড়া থেকেই সমর্থন জাগানো হয়। ১৯৫২ সালের ১ মার্চ সংখ্যার সম্পাদকীয় 'তরুণের রক্তদান'-এ লেখা হয় : 'প্রকৃতভাবে মানবতারই এই দাবী। মানুষের মৌলিক অধিকার যে স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতারই এ দাবী। বস্তুত জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতি এবং সভ্যতাই যদি বিনষ্ট হয়, তবে তাহার স্বাধীনতার কোন মূল্যই থাকে না।' 'ভাষা-আন্দোলন যে মূলত সংস্কৃতিক আন্দোলন, 'দেশ' সে-কথাটিই স্মরণ করিয়ে দেয়। এরপরেও ২২ মার্চ 'পূর্ববঙ্গ ফ্যাসিস্ট নীতি' এবং ৫ এপ্রিল ও ২৬ এপ্রিল প্রকাশিত সম্পাদকীয়তেও 'একুশের' সমর্থনে ব্যাখ্যা রাখা হয়।

১৯৫২ সালের ২৯ মার্চ 'একুশে'-এর প্রায় একমাস পরে 'দেশ' পত্রিকায় বাংলার বিশিষ্ট কবি জীবনানন্দ দাশ-এর 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ষ্ট ঐ প্রবন্ধে তিনি প্রাসঙ্গিক লেখেন : 'সংবাদ পড়ে মনে হয় খুব সম্ভব বেশি সংখ্যক পাকিস্তানিই বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্থিত দেখতে চান। এঁদের ইচ্ছা ও চেষ্টা সফল হলে পশ্চিমবাংলার ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষেও খুব বড় লাভ।' এই সময় ১২ এপ্রিল অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় 'দেশ'-এ লেখেন 'ভাঙা বাংলার সাহিত্য'। তিনি নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে ঐ প্রবন্ধে দুই বাংলার সাহিত্যিকে মিলনমন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার কথা বলেন। এই পর্যায়ে 'দেশ' পত্রিকার শেষ প্রবন্ধ অন্নদাশংকর রায়ের 'নতুন অধ্যায়'। লেখাটি ঢাকার 'দ্যুতি' পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত বলে জানানো হয়। তিনি রাজনীতি ও জনমানসের বিবেচনার কথা মাথায় রেখে ভাষা-সমস্যার বিশ্লেষণ করেছেন ঐ প্রবন্ধে। তিনি তখন বাংলাভাষার সপক্ষে বলেন : 'দিন বদলাচ্ছে, মন বদলাচ্ছে—এমন দিন নিকট যেদিন তিনি দেখবেন— 'কোরান পড়া হয় বাঙলায়।' সমকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা (১৯৫২-১৯৫৩) 'একতা'য় সমকালীন পূর্ব বাংলার ভাষা-আন্দোলন বিষয়ে দুটি লেখা প্রকাশিত হয়। একটি ছিল সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিবেদন এবং দ্বিতীয়টি ছিল ঢাকা থেকে এপারে আসা স্মৃতির আখরে লেখা কোনো এক সহপাঠীর রচনা। প্রতিবেদনে লেখা হয় : 'পূর্ব-বাংলার শহীদদের এই আত্মদান যেন ব্যর্থ না হয়। পূর্ব-বাংলার ভাষা বাঙলা আমাদেরও মাতৃভাষা। আমাদের ভাষাকে আমরা বাঁচাব।' বাংলাদেশের 'একুশে'র আন্দোলন এপারের বাংলাভাষী তরুণ সমাজকেও কীভাবে আলোড়িত ও অঙ্গীকারবদ্ধ করেছে, এই প্রতিবেদন সেই ইতিহাসই তুলে ধরেছে।

বলো কোন্ ভাষার কথা বলবে —

১৯৫২ সলের 'একুশে'র প্রতিক্রিয়া পড়েছিল তৎকালীন প্রগতিমনস্ক কবি সিদ্ধেশ্বর

সেন-এর কবিতায়। 'পরিচয়' (আগষ্ট সেপ্টেম্বর, ১৯৫২/১৯৫৯, বঙ্গাব্দ, ভাদ্র-আশ্বিন)-এ 'কোন্ ভাষায় কথা বলবে' শিরোনামে প্রকাশিত হয় :

জীবন ভঙ্গুর ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে
ধুলোয় কাঁকরে হাসি কান্না মুখ লুকোয়
দিনরাত্রি একই বৃত্তে ফুঁপিয়ে কাঁদে

....

আমার অস্তিত্ব তোমার অস্তিত্বে বাঁধা
আমার শিকড় তোমার মাটিকে খোঁজে
আমার দিন চায় তোমার বাতির সাড়া
বলো কোন্ ভাষার কথা বলবে?

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ১৯৫৩ সালে রচিত কবিতা 'পারাপার' মূলত ১৯৫২ সালেরই '[illegible]জাত।' তিনি লেখেন :

আমরা যেন বাংলাদেশের
চোখের দুটি তারা
মাঝখানে নাকি উঁচিয়ে আছে—
                থাকুক গে পাহারা।
দুয়ারে খিল
        টানে দিয়ে তাই
                খুলে দিলাম জানালা
                        ওপারে যে বাংলাদেশ
                                এপারেও সেই বাংলা।

[illegible]জিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, কিন্তু ভাষার বন্ধনে এক বৃন্তের কুসুম বাঙালি-জাতিসত্তা। [illegible] 'বাংলাই' তার হৃদয়, ধর্ম তাকে বিভাজন করতে পারেনি। কবির অন্তরে [illegible] মন্ত্রের তরঙ্গধ্বনি বাংলাভাষা, তথা 'একুশে'র অনিবার্ণ শিখা।

[illegible] 'একুশে' : মিনি-সাহিত্য —

[illegible] আসামের ভাষা-আন্দোলন ও বিহারের বাংলা-হিন্দী ভাষা-পরিস্থিতি নিয়ে [illegible] চললেও পূর্ববঙ্গের ভাষা-আন্দোলন বা একুশে-এর ওপর ভিত্তি করে [illegible], [illegible]শেষত ষাটের শেষপাদে অর্থাৎ বাংলাদেশের দুর্বার গণআন্দোলনের সময়ে '[illegible]' [illegible] নিয়ে কলকাতার সাহিত্যিকদের কলম থেকে তেমন একটা রচনা লেখা [illegible]। [illegible] ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ-এ যখন [illegible] জনগণ অস্ত্র নিয়ে সমরাঙ্গনে ধাবমান, তখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত [illegible] 'অনুত্তম' ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০), 'কণ্ঠস্বর' (একুশে ফেব্রুয়ারি স্বরণ সংখ্যা), '[illegible]' ([illegible], ১৯৭০) এবং 'এখন' (ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০) বিশেষ 'একুশে' সংখ্যা প্রকাশ [illegible]। [illegible] চট্টোপাধ্যায় এবং আশীষতরু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পৃথিবীর প্রথম মিনি [illegible]' [illegible] মার্চ ৭০ সংখ্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা 'একুশে' এবং নারায়ণ [illegible] 'একুশে ফেব্রুয়ারি' পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের [illegible] এরকম ঃ

[illegible] জিনিস তালাবন্ধ—
[illegible]
[illegible] করে খুঁজছি।

ছোট মেয়েটা হঠাৎ
আমার মুঠোটা খুলে দিয়ে বলল,
এই তো!
এতক্ষণ তো তোমার হাতের মধ্যেই ছিল!

মুক্তির চাবি 'একুশে'। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রক্তাক্ত যুদ্ধ এবং তার পরিণতি স্বাধীন বাংলাদেশ। 'একুশে' ফেব্রুয়ারি সেই চাবি, যা আমাদের হাতের মধ্যেই ছিল, শুধু খোলার অপেক্ষায় বাক্সবন্দী। এই সংখ্যার অনন্য গল্প 'একুশে ফেব্রুয়ারী', যা সেলুলয়েডের চিত্রনাট্যের মতো সংহত এবং স্বল্পবাক :

'চৌধুরী সাহেবের বাড়ীর ছেলেদের মতো সে ইংরেজি শিখবে। ছেলেবেলায় এই স্বপ্ন দেখত সে। আর স্বপ্নটা এলেই হারিয়ে যেত সামনের মাঠ, আকাশ গাছপালা, পাখির ডাক, হাওয়ায় মৌরি ফুলের গন্ধ, নদীতে জেলেডিঙ্গিগুলো।

সে ইংরেজি পড়ার স্বপ্ন দেখত। আর সেই ফাঁকে কখন তার গোরুগুলো বেড়া ভেঙ্গে ঢুকে পড়ত প্রতিবেশীর বাগিচায়। মার-মার করে লাঠি হাতে তেড়ে আসত তারা। গরিব ক্ষেত-মজুরের ছেলে।

মা বলত, ইংরেজি তোকে কে শেখাবে বাবা? মক্তবের মাইনে দিতে পারিনি—মৌলবী সাহেব তোকে পড়াতে চায় না। কী করে বড় ইস্কুলে পাঠিয়ে তোকে ইংরেজি পড়াব?

সে ভাবত, পালিয়ে যাবে। মা বুঝতে পারত।

'ইংরিজি শিখে তোর আম্মাকে ভুলে যাবি। দেশ-গাঁকে ভুলে যাবি। চৌধুরী সাহেবের বড় ছেলে কলকাতা শহরে গিয়ে—'

মা-কে জড়িয়ে ধরে সে বলত : 'না-না কখনো ভুলব না— কোনো দিন না।' সে পালিয়ে গেল তারপর।

কিন্তু ইংরিজি শেখা হল না—কিছুই না। মন্বন্তর এল। ঘূর্ণি। কোথায় বাপ-কোথায় মা-কোথায় ভিটে! বিস্তর মানুষের হাড় জমে ছিল এখানে-ওখানে, কে কাকে গোর দেয় তখন? বাপ-মার হাড় সে চিনতে পারেনি। সেই পাঁজার ভেতরে। সে ইংরেজি শিখল না। শহরের হোস্টেলে গোস্ত রাঁধতে লাগল।

আরো কত বছর কেটে গেল।

তারপর শহরে নামল সৈন্য। উঠতে লাগল গুলির আওয়াজ। রক্তে ভেসে যেতে লাগল মাটী।

বুকের ভেতর যন্ত্রণা ঝকঝক করে উঠলো। কতকাল পরে। মন্বন্তরের হাড়ের পাঁজা থেকে তার আম্মার হাড় সে চিনে নিতে পারেনি। আজ শুনল মা-র কান্না : 'ইংরেজি শিখে তুই আমাকে ভুলে যাবি?"

ইংরিজি নয়। আর এক শত্রু। কিন্তু কি তফাৎ।

ছুটে বেরিয়ে এল রাস্তায়। রাইফেলের মুখোমুখি। চিৎকার করে বলল : 'ভুলব না—আমার আম্মাকে কোনোদিন ভুলব না।

গুলির শব্দ উঠল। ধান খেত। আকাশ। নদী। পাখি। মৌরিকূলের গন্ধ। একুশে ফেব্রুয়ারী শুধু পূর্ব বাংলা নয়, সারা বাংলা দেশ মা হয়ে তাকে বুকে টেনে নিল।'

অন্যন্যসাধারণ এই মিনি-গল্পটি বিশ্ব-সাহিত্যের গল্প-সম্ভারে জায়গা পাওয়ার যোগ্য।

নন্দদুলাল ভট্টাচার্যের 'এখন' বাংলার প্রগতিশীল মিনি-পত্রিকা। এর ফেব্রুয়ারির

১৯৭০ সংখ্যায় (১ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংকলন) মুকুট সেনগুপ্ত-এর 'শপথ' এবং নন্দদুলাল ভট্টাচার্যের 'ঝড় উঠবে বলে', 'একুশে'-র এবং শহীদদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সত্যরঞ্জন বিশ্বাসের যিনি কুইন 'কণ্ঠস্বর'-এর 'একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণ সংখ্যা' দুই বাংলার কবিদের কবিতা বিন্যস্ত। এই সংখ্যায় প্রকাশিত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-এর 'পূব পশ্চিম' দুই বাংলার মানুষ, ভাষা ও সংস্কৃতির অভিন্ন জ্যা-যোজনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় : 'আমরা ভাষায় এক ভালোবাসায় এক মানবতায় এক,..../আমরাই একে অন্যের হৃদয়ের অনুবাদ.... ।' এই সংখ্যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণ' করতে গিয়ে লেখেন ঃ 'রাজনীতির বিধানে পরবাসী হয়েও সে বাংলা দেশ আমারও, মামিও তার উত্তরাধিকারের বাঙালী। একুশে ফেব্রুয়ারির এই ঐতিহাসিক লগ্নে দাঁড়িয়ে পূর্ব বাংলার মহিমাজ্জ্বল রূপের মধ্যে আমার সেই পূর্ব বাংলাকে আমি প্রণাম করি।' বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই নিবেদন তাঁর ফেলে আসা বাংলাদেশকে স্মরণে-বেদনায়-বিষন্নতায়-আত্মমগ্নতায় হৃদয়ে ধারণ করা। শশিধর রায় সম্পাদিত 'অনুত্তম'-এর একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যাটি অনন্য। দুই বাংলার বিশিষ্ট কবিদের কবিতা সংকলিত হয়েছে এই সংখ্যায়। সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে : '২১শে ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ সাল। একটি উজ্জ্বল দিন। বাঙালির ঘরে ফেরার দিন।' সত্যি একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির স্বদেশযাত্রা। এই সংখ্যায় প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কবিতা এবং গল্পে 'একুশে' এবং বাংলাদেশের স্মৃতি একাকার হয়ে গেছে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুষ্ঠ পালের ছড়া', অর্ধেন্দু কুমার নন্দীর 'রক্তে রাঙ্গা ২১ শে ফেব্রুয়ারী' এবং সুবীর রায়চৌধুরীর 'একুশে ফেব্রুয়ারির কলঙ্ক' মনোজ্ঞ। সুবীরবাবু তাঁর রচনায় পশ্চিমবঙ্গবাসীর বাঙালিকে ধিক্কার জানিয়েছেন 'একুশে'র আত্মত্যাগের সঙ্গে প্রতিতুলনা করে।

১৯৭০ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি 'সাপ্তাহিক বসুমতী' (সম্পাদক : জয়ন্তী সেন) তিনটি প্রবন্ধ এবং তিনটি কবিতা দিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে স্মরণ করে। সম্পাদকীয়তে 'একুশের' তুলনা করে হিন্দীর আগ্রাসন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাষানীতির সমালোচনা করে আলোকপাত করা হয়। অমিয়কুমার হাটির 'একুশে স্মরণে বজ্রে বাজে বাঁশী', অপর্ণা ভাদুড়ীর 'একুশে ফেব্রুয়ারী : স্মৃতি, ঐতিহ্য ও আজকের সংগ্রাম' এবং কমলকুমার মিত্রের 'একুশে ফেব্রুয়ারী প্রসঙ্গে' প্রবন্ধত্রয়ে 'একুশে'র চেতনা, প্রাসঙ্গিকতা, ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং সমকালীন গণ-অভ্যুত্থানের সংলগ্নতার প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের ভাষা পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ ও বিষন্নতা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশিষ্ট প্রগতিশীল কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত-এর 'একুশে ফেব্রুয়ারী', উমাপদ নাথের 'একুশে ফেব্রুয়ারি' এবং অমিতাভ ভৌমিকের 'স্ববিরোধিতার উন্মত্ত প্রাচীর'—এ একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলন এবং উনসত্তরের দুর্বার গণ-অভ্যুত্থানের সমীভবনের সন্ধান করা হয়েছে। তবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পরের বছর প্রচুর রচনা সৃষ্টি হলেও 'একুশে' ভিত্তিক তেমন কোনো রচনা চোখে পড়ে না। তবে যুদ্ধচলাকালে বদরুদ্দীন উমরের ভাষা-আন্দোলন প্রসঙ্গে একটি রচনা বেশ আলোড়ন তুলেছিল। ১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নবজাতক প্রকাশন থেকে বিশিষ্ট কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'একুশের রক্তে' প্রকাশিত হয়। দুর্ময় সংগ্রামের সময়ে রচনা সংগ্রহ করে, এপারের 'কম্পাস-সরণী' এবং 'রাঙামাটি' থেকে কিছু লেখা নিয়ে এই সংকলনটি তৈরি করা হয়। সাহিত্য এবং শিল্পবিচারে এসব রচনা তেমন মহার্ঘ না হলেও ইতিহাসের ধারায় তা